ধ্বনিবাদ ও রসবাদ

আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বনি প্রস্থানের প্রবক্তা। যদিও তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থের প্রথম কারিকাতেই বলেছেন—'**কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ**' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা যে ধ্বনি, তা আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, কেবলমাত্র ধ্বনি বিরোধীদের মত খণ্ডন করে ধ্বনিকে স্বমহিমায় স্থাপন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তবুও তাঁকেই ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবর্তকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ধ্বনি অর্থাৎ ব্যঞ্জনা, প্রতীয়মান অর্থ। যে কাব্যে বাচ্যবাচক গুণীভূত থেকে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জককে প্রধান করে সেই প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে — তাকেই ধ্বনি বলে। তাঁর মতে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। আচার্য অভিনবগুপ্তও আনন্দবর্ধনের পথের পথিক।

ধ্বনি অলংকার শাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। কাব্যের ধ্বনি বলতে বোঝায় কাব্যের একটি অর্থ যা কাব্যের শব্দরাশি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বোঝায় না, বোঝায় ইঙ্গিতে, আভাসে

ব্যঞ্জনায়, কাব্যের বাচ্যার্থের অনুরণনক্রমে। কাব্যের বাচ্যার্থ একটি মাত্র, তা যখন বাধিত না হয়ে নিজ স্বরূপে প্রকাশ পেতে থাকে, অথচ তাকে অতিক্রম করে পাঠকের চিত্তে একই সময়ে আরেকটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই প্রতীয়মান অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি। এই প্রতীয়মান অর্থটি বাচ্যার্থ দ্বারা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়, এবং অনেক সময়ে তা হতে সমধিক মনোহর হয়ে থাকে। এই অর্থ হয় বাচ্যার্থ দ্বারা দ্যোতিত, ব্যঞ্জিত বা প্রতীয়মান। যে ব্যাপারের দ্বারা এই ধ্বনি প্রতীয়মান হয়, তাকে বলে দ্যোতনা ব্যঞ্জনা বা ধনন ব্যাপ্যার। ধনন ব্যাপারকে বলে suggestion। যে শক্তির বলে এই ধ্বনি আসে তাকে বলে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা শক্তি, ইংরাজিতে বলে power of suggestion।

যে ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা বাচ্যার্থকে আশ্রয় করে বক্তা, বোদ্ধব্য, প্রকরণ, দেশ, কাল, কণ্ঠস্বর বা অঙ্গচেষ্টা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হেতু অন্য একটি অর্থ প্রতীয়মান হয় তার নাম আর্থী ব্যঞ্জনা।

ধ্বনিকার সহৃদয় শ্লাঘ্য কাব্যার্থের দুটি ভেদের কথা বলেছেন ব্যাচার্থ ও প্রতীয়মান অর্থ। বাচ্যার্থ অভিধা শক্তি দ্বারা লভ্য মুখ্যার্থ; প্রতীয়মান অর্থ ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা লভ্য ব্যঙ্গ্যার্থ। ধ্বনিকার আনন্দর্ধন বাচ্যার্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে প্রতীয়মান অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন—

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতিলাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।।[৫৪]

অঙ্গনাদেহের লাবণ্যের ন্যায় মহাকবিদের বাণীতে প্রতীয়মান অর্থ নামে অন্য একটি বস্তু থাকে যা তাদের প্রসিদ্ধ অবয়বের থেকে অন্য কিছু — তাই ধ্বনি। অঙ্গনাজনের লাবণ্য যেমন তার অবয়বের অতিরিক্ত অন্য জিনিস, অথচ তা অবয়বের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। প্রতীয়মান অর্থও সেই প্রকার কাব্যে অবয়বস্বরূপ শব্দ, অলঙ্কার, গুণ, রীতি প্রভৃতি নিয়ে বাচ্যার্থ, তার অতিরিক্ত অন্য জিনিস, কিন্তু ঐ বাচ্যার্থ দ্বারাই তার প্রকাশ ঘটে। বাচ্যার্থ তাই মোটেই তুচ্ছ কারবার নয়। ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য হলেই ব্যাচার্থকেই প্রথম উপাসনা করতে হবে—

আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবাঞ্জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ।।[৫৫]

যিনি আলোক চান, তিনি যেমন দীপশিখারূপ উপায়ের প্রতি যত্নবান হন, ব্যঙ্গ্যার্থের যিনি আদর করেন তিনিও সে রূপ বাচ্যার্থের প্রতি যত্নশীল হন। এই ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির সংজ্ঞা দিয়েছেন আনন্দবর্ধন—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।।[৫৬]

যেখানে কাব্যের অর্থ বা শব্দ নিজেদেরকে অপ্রধান করে সেই প্রতীয়মান অর্থকে ব্যঞ্জিত করে, সেখানে সেই ব্যঙ্গ্যার্থরূপ কাব্য বিশেষই পণ্ডিতগণ কর্তৃক ধ্বনি বলে কথিত হয়। তাই প্রকৃত ধ্বনি হতে গেলে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য এবং সমধিক মনোহারিত্ব চাই। ব্যঙ্গ্যার্থ থেকেও যদি অপ্রধান হয় অর্থাৎ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক মনোহারী না হয়ে তা যদি বাচ্যার্থকেই অধিক মনোহারী করে তোলে, তাহলে তা আসল ধ্বনি কাব্যের বিষয় হয় না। এরূপে সমাসোক্তি, ভ্রান্তিমান, সংশয় প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্গ্যার্থে থাকলেও তা প্রকৃত ধ্বনি পদবাচ্য হয় না। বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন বলেছেন—

ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ। ন চৈতৎ সমাসোক্ত্যাদিষু অস্তি।[৫৭]

ধ্বনি বাচ্যার্থ থেকে পৃথক। ধ্বনি তিন প্রকার — বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি। এই তিন ভেদই বাচ্যার্থ থেকে পৃথক্। প্রতীয়মান অর্থ বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়েই বস্তু অলংকার রসধ্বনিতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং তিন প্রকার ধ্বনিরই সামান্য লক্ষণ হল — **'বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বম্'**।[৫৮] ধ্বনন শব্দ ব্যাপার হলেও অর্থের শক্তির সহায়তা সর্বত্রই থাকবে। তবে বস্তুধ্বনি অলংকারধ্বনি অভিধার দ্বারাও কদাচিৎ প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু রসধ্বনি কখনও নয়। তাহলে বস্তুধ্বনিও অলংকারধ্বনি স্বীকারের সার্থকতা কোথায়? উত্তরে বলা যায় যে,

বাচ্যোঽর্থো ন তথা স্বদতে
প্রতীয়মানঃ স এব যথা।।[৫৯]

বাচ্যসার্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়ে যখন রস প্রতীয়মান হয়, তাকে রসধ্বনি বলে। এই রসধ্বনিই মুখ্য। বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি রসধ্বনিতেই পর্যবসিত হয়। বস্তুধ্বনি ও

অলংকারধ্বনি উভয়ই সংলক্ষ্য ক্রমধ্বনি। যেখানে বাচ্যার্থ হতে একটি বস্তু বা অলংকার ব্যঞ্জিত এবং উহা বাচ্যার্থ থেকে সমধিক মনোহারী হয়ে প্রধান হয়, সেখানে ধ্বনিকে যথাক্রমে বস্তুধ্বনি বা অলংকারধ্বনি বলা হয়ে থাকে। ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ হতে প্রধান না হলে ধ্বনি হয় না, তা গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হয়ে থাকে।

আচার্য আনন্দবর্ধনের মতে রসই (রসধ্বনিই) কাব্যের আত্মা এবং কবিচিত্তের রসানুভূতিই কাব্যের জন্ম দেয়। রসধ্বনিই যে কাব্যের সার — এ বিষয় আনন্দবর্ধনের আবিষ্কার নয়। বস্তু, অলংকার এবং রস—ধ্বনির এই তিন ভেদের মধ্যে বস্তু এবং অলংকার যে রসেই পর্যবসিত হয় তা অভিনব গুপ্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। "**তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বস্ত্বলংকারধ্বনীতু সর্বথা রসং প্রতি পর্যবস্যেতে ইতি বাচ্যাদুৎকৃষ্টৌ তাবিত্যভিপ্রায়েন 'ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মা' ইতি সামান্যেনোক্তম্।**"[৬০]

ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধন কাব্যের আত্মা ধ্বনি একথা যেমন বলেছেন তেমনই ধ্বনিই পরিণামে রস সৃষ্টি করে একথাও বলেছেন। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন ব্যাচার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ শ্রেষ্ঠ একথা স্বীকার করেছেন। বাচ্যার্থ যে কোন সাধারণ ব্যক্তিই বুঝতে পারে। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে কেবল সহৃদয় পাঠক। যথার্থ কবি তাঁর কাব্যের কথা সরাসরি বাচ্য অর্থে কখনও বলেন না, তা ব্যঙ্গ্যের আকারে সকথিত থাকে। তিনি বলেছেন যে, কেবল একটি অঙ্গে অলংকার ধারণ করলেও কামিনী যেমন শোভা পায় সেরূপ সুকবি প্রযুক্ত কেবল একটি পদের দ্যোত্য (প্রকাশ) ধ্বনি দ্বারা সমস্ত বাক্যই শোভা পায়। তা উদ্ঘাটিত হয় প্রকৃত কাব্যজ্ঞানের দৃষ্টিতে। তাই এদিকে দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় কবি হালের 'গাথাসপ্তশতী' একটি উৎকৃষ্ট ধ্বনিকাব্যও বটে। এর প্রায় প্রতিটি গাথাতেই একাধিক ব্যঙ্গ্যার্থ বিদ্যমান।

বস্তুধ্বনি যে বাচ্য থেকে পৃথক্ তা দেখাতে গিয়ে আনন্দবর্ধন 'গাথাসপ্তশতী' থেকে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। প্রতীয়মান অর্থের দুই ভেদ লৌকিক এবং কেবলকাব্যব্যাপার গোচর। লৌকিক প্রতীয়মান বিধি, নিষেধ প্রভৃতি। অর্থাৎ কোথাও বাচ্যার্থে আছে বিধি, কিন্তু প্রতীয়মানার্থে আছে নিষেধ। যেমন—

ভম ধম্মিঅ বীসত্থো সো সুণও অজ্জ মারিও তেণ।
গোলা-অড-বিঅড-কুডঙ্গ-বাসিণা দরিঅ-সিহেণ।।[৬১]
[ভ্রম ধার্ম্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকঃ অদ্য মারিতঃ তেন।
গোদা-তট-বিকট-কুঞ্জ-বাসিনা দৃপ্ত-সিংহেন।।]

অর্থাৎ, হে ধার্মিক, তুমি নিশ্চিন্তে, ভ্রমণ কর। গোদাবরী নদীর তীরের লতাকুঞ্জে বাস করা একটি তেজোদৃপ্ত সিংহ আজ সেই কুকুরটিকে মেরে খেয়েছে। এখানে বাচ্য অর্থ বিধি, প্রতীয়মান অর্থ কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ নিষেধ। কোন নায়িকা তার নায়কের সঙ্গে মিলিত হয় নিভৃত সংকেতকুঞ্জে। এক ব্রাহ্মণ সেখানে ফুল তুলতে আসে। তাতে নিভৃত মিলনে ব্যাঘ্যাত ঘটে। অভিনবগুপ্ত এখানে আরো একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ফুল-পল্লব সংগ্রহ করতে আসায় সংকেতস্থানের যে স্বাভাবিক গোপনীয়তা তা নষ্ট হচ্ছিল। তাই ব্রাহ্মণ যাতে সেখানে আর না আসে তার উপায় বের করতে হবে। তাই নায়িকা ব্রাহ্মণকে বলেছেন—ওহে ব্রাহ্মণ, যে কুকুরের জন্য আপনি ফুল তুলতে ভয় পেতেন, সেই ভয় আর নেই। আজ আপনি নিশ্চিন্তে এখানে ভ্রমণ করুন। কেননা, আজই গোদাবরী নদীর তীরে কুঞ্জে থাকা এক ভয়ঙ্কর সিংহ সেই কুকুরটিকে মেরে ফেলেছে।

গাথাসপ্তশতীর শ্লোকগুলি মুক্তক শ্লোক। এখানে কুকুরের ভয় দূর হলেও সিংহের ভয় এসেছে। এখানে রমণীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। যে কুকুরকে ভয় করে সে যে সিংহের ভয়ে সংকেত স্থানে আর যাবে না সেটা নিশ্চিত। অতএব এখানে ভ্রমণ নিষেধই উদ্দেশ্য এবং ভ্রমণ বিধির স্থলে ভ্রমণ নিষেধরূপ বস্তু ধ্বনিত হয়েছে। কখনও কখনও কাব্যে নিষেধরূপ থাকলেও বিধিররূপে প্রতিভাত হয় যেমন—

এত্থ ণিমজ্জই অত্তা এত্থ অহং এত্থ পরিঅণো সঅলো।
পন্থিঅ রত্তি-অন্ধঅ মা মহ সঅণে ণিমজ্জিহিসি।।[৬২]
[অত্র নিমজ্জতি শ্বশ্রূঃ অত্র অহং অত্র পরিজনঃ সকলঃ।
পথিক রাত্র্যন্ধক মা মম শয়নে নিমঙ্ক্ষ্যসি।।]

অর্থাৎ, এখানে শ্বশ্রূমমাতা শয়ন করেন (নিদ্রামগ্ন থাকেন), এখানে আমি শয়ন করি। দিবাভাগে ভালো করে দেখে রেখো। ওহে রাতকানা পথিক, তুমি আবার আমাদের শয্যায় শয়ন করিও না যেন। কোন প্রোষিতভর্তৃকা তরুণীকে দেখে কোন ধনী পথিক কামাতুর হলে এ নিষেধের দ্বারা তরুণী তাকে উপভোগের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এখানে বিধি হচ্ছে নিষেধের অভাব। আসলে এখানে নিষেধের নয়, ব্যঙ্গ্য অর্থ হল বিধি উদ্ধৃত উদাহরণে 'অত্তা' পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এখানে নিভৃত সম্ভোগ সম্ভব নয়। 'অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়' এই অংশের

দ্যোতনা হচ্ছে মদন শরে বিদ্ধ তোমাকে উপেক্ষা করা অনুচিত হলেও ইহা দিবাভাগ, দিবাভাগে সম্ভোগ অনুচিত। তবে দেখে রাখো— আমি এখানেই আছি। আমরা পরস্পরের মুখাবলোকনের দ্বারা দিবাভাগে চিত্তবিনোদন করব। 'রাত্র্যন্ধ' পদের দ্বারা নায়কের কামাকুলতা বোঝানো হয়েছে এবং সংকেত করা হয়েছে যে রাত্রি হওয়া মাত্রই যেন কামাকুলতাবশত: অন্ধ হয়ে আমার শয্যায় এসো না। নিকটে কন্টকের মতো শাশুড়ি নিদ্রিতা হয়েছেন কিনা ভালোভাবে বুঝে তবে এসো।

এরূপ, কখনও কখনও বাচ্যে বিধিরূপ থাকলেও ব্যাঙ্গার্থে কোন অর্থই (বিধি বা নিষেধ) প্রকাশিত হয় না যেমন এক গাথায় আছে—

বচ্চ মহ ব্বিঅ এক্কেই হোন্তু নীসাসরোই অব্বাইং।

মা তুজ্ঝ বি তীঅ বিণা দক্খিণ্ণ ই অস্ম জাঅন্তু।।

তুমি চলে যাও। দীর্ঘনিঃশ্বাস ও রোদন আমার একার ভাগ্যেই থাকুক। তোমার দাক্ষিণ্য আজ বিনষ্ট হয়েছে বলে তার অভাবে তোমারও যেন এই দশা না হয়। এখানে যদিও নির্দেশ আছে (ব্রজ-যাও), তবুও ইহা এখানে নির্দেশও বোঝাচ্ছে না নির্দেশের অভাবও বোঝাচ্ছে না। অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ উভয়রূপেই এখানে অনুপস্থিত। গাথাটি সম্পূর্ণ অন্য বস্তু ধ্বনিত করেছে, তা হচ্ছে খণ্ডিতা নায়িকার তীব্র হৃদয় জ্বালা। আবার কখনও কখনও বাচ্যার্থে নিষেধ থাকলেও ব্যঙ্গ্যার্থে বিধি বা নিষেধ কিছুই থাকে না। আনন্দবর্ধনাচার্য ধ্বনিকাব্যের উদাহরণ স্বরূপ, 'গাথাসপ্তশতীর' বিভিন্ন গাথা গ্রহণ করায় উক্ত গ্রন্থে ধ্বনির বিদ্যমানতা স্বীকৃত হয়, ফলে সাহিত্যিক মূল্যায়নও স্বীকৃত হয়।

ধ্বনিবাদী আচার্যদের মতে বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিই প্রধান এবং কাব্যের প্রাণকেন্দ্র। ইহাই মুখ্য লক্ষ্য। শব্দ, বাক্যার্থ, ছন্দ, রীতি ও অলংকার — এরা রসপ্রতীতির উপায় মাত্র। কাব্যে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রসই আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে এদের আকর্ষণ করে আনে। যে রস কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু সেই রস যে কাব্যে প্রধানভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়, সে কাব্য অবিসংবাদিত ভাবে ধ্বনির ক্ষেত্র। একে অলংকারের ক্ষেত্র বললে এর মর্যাদাহানি ঘটে। তাই আনন্দবর্ধনাচার্যের সিদ্ধান্ত রস যেখানে প্রধানভাবে অভিব্যঞ্জিত, সেখানে রসধ্বনি, অপরদিকে রস যেখানে প্রধানীভূত অন্য অর্থের উপকারক ও

অলংকারস্বরূপ, সেখানে রসবদলংকার। রসবদালংকার কখনও সর্বাপ্রেক্ষা চিত্তচমৎকৃতিজনক রসধ্বনির মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে না। রসধ্বনির রস অঙ্গী, রসবদলংকারের রস অঙ্গ। ধ্বনিকাব্যে অলংকারের দীপ্তি থাকে, কিন্তু প্রাধান্য থাকে না। সৌন্দর্য থাকে, কিন্তু সেই সৌন্দর্য রসের সর্বাতিশয়ী, চারুত্বকে লঙ্ঘন করতে পারে না। আনন্দবর্ধনাচার্য গুণ ও অলংকারকে কাব্যের বহিরঙ্গ ধর্ম বলে উল্লেখ করেন নাই। তিনি কাব্যের প্রাণকেন্দ্রীভূত রসের বন্ধনে সমস্ত কাব্যোপরকরণকেই বন্ধন করেছেন। ফলে গুণ এবং অলংকারও সম্পূর্ণরূপে রসপরতন্ত্র হয়ে উঠেছে। আনন্দ বর্ধনাচার্যের ধ্বনিসূত্রে কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু রসের সার্বভৌমত্বই স্বীকৃত হয়েছে। তাই আনন্দবর্ধনাচার্য গুণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন কাব্যের আত্মভূত রসকে অবলম্বন করে যে ধর্মগুলি থাকে তারা গুণ। তিনি গুণকে রসাশ্রিত ধর্ম বলে স্বীকার করেছেন। ধ্বনি হল অঙ্গী, গুণ, অলংকার প্রভৃতি অঙ্গ। গুণ, অলংকার প্রভৃতি কাব্যোপকরণের সাহায্যেই ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রসগতবৈশিষ্ট্য :

কাব্যসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে রস এবং ভাব এই দুটি উপাদান নাট্যও কাব্যেরই অন্তর্গত। তাই কাব্য-নাটকের মূল্যায়ন করতে হবে রস ও ভাবের অস্তিত্ব বিচার করে। সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক্ থেকে এই দুটি বস্তুর মৌলিক ব্যাখ্যা করেছেন আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে। পরবর্তীকালে অবশ্য আলংকারিকগণ আরও বহুবিস্তৃত আলোচনায় তৎপর হয়েছিলেন, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের বিচার অলংকারশাস্ত্রে প্রথমও বটে, প্রধানও বটে।

রস ও ভাবের সঙ্গে অভিনয়, ধর্ম, বৃত্তি, প্রবৃত্তি এবং সিদ্ধি এগুলির ভূমিকাও বিশ্লেষণ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত রসের সংখ্যা আট - শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত। আচার্য ভরত বলেছেন, ব্রহ্মা আটটি রসের কথাই বলেছেন। তবে রসতত্ত্ব ও বিভিন্ন রসের স্বীকৃতি ভরতের বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছিল নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু প্রাচীনতর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ভাব হচ্ছে তিনটি স্থায়ী, সঞ্চারী এবং সত্ত্বজ। এছাড়া ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখও ভরত করেছেন।

রসসম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য ভরত বলেছেন—**'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে'**[৩] অর্থাৎ রস ব্যতিরেকে কোনও অর্থই প্রবর্তিত হয় না। অর্থ এবং রস একে অপরের সঙ্গে

সম্পৃক্ত। অর্থের রস পরিস্ফুট হয়। আবার যে বাক্যে কোন রস পাওয়া যায় না—সৌন্দর্যের বিচারে তার কোনও স্বীকৃতি নেই। সে বাক্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাক্য — তার সাহিত্যিক মূল্য নেই। বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাব এই তিনটির সংযোগেই রস নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। আচার্য ভরত বলেছেন—'**বিভাবানুভাব ব্যভিচারী সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ**'[৬৪] রসনিষ্পত্তি শব্দটি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং মতানৈক্যও কম নেই, কিন্তু মনে হয় আচার্য ভরতের উদ্দেশ্য ছিল রসসিদ্ধি বোঝানো। নিষ্পত্তির অর্থ সিদ্ধি করলেই আচার্যের মতবাদ স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সম্যক্ যোগে রসসৃষ্টির ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ হয়। তাই দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন— যেন ব্যঞ্জন এবং ওষুধি (ভেষজ) দ্রব্যাদির সঙ্গে রস নিষ্পত্তি হয় তেমনি নানাভাবের উপগমে রসনিষ্পত্তি ঘটে। আচার্য আরও বুঝিয়ে বলেছেন—যেমন গুড়াদি বিভিন্ন দ্রব্য, বিবিধ ব্যঞ্জন, বিবিধ ওষধি দ্বারা ছয়টি রস (লবণ, অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু ও কষায়) নিবর্তিত হয়, তেমনি নানাভাবের মিশ্রণে স্থায়ী ভাবগুলি রসত্ব প্রাপ্ত হয়। **'উচ্যতে যথা নানাব্যঞ্জনৌঽষধি দ্রব্যসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ' তথা নানাভাবের রসনিষ্পত্তিঃ। যথাহি গুড়াদিভির্দ্রব্যৈব্যঞ্জনৈরোষধীভিশ্চ ষড়রসা নিবর্তন্তে এবং নানা ভাবোপহিতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমপ্নুবন্তি। অত্রাহ-রস ইতি কঃপদার্থঃ?** রস পদার্থটি কি? আচার্য বলেছেন—'**আস্বাদ্যত্বাৎ**' অর্থাৎ যেহেতু এটি আস্বাদিত হয়, সেহেতু রস নাম হয়েছে। কথমাস্বাদ্যতে রসঃ? কিভাবে রস আস্বাদিত হয়? বলা হয়েছে— যেমন রসিক সুজন নানা ব্যঞ্জনসংস্কৃত অন্ন আহারের সময় তার রস আস্বাদন করেন এবং আনন্দাদি লাভ করেন। তেমনি সহৃদয় দর্শকগণ নানাভাবের বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে ব্যক্ত স্থায়ীভাব সমুহ আস্বাদন করেন ও আনন্দাদি উপভোগ করেন। **"যথাহি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ান্তি সুমনসঃ পুরুষাঃ হর্ষাদীংশ্চাপ্যধিগচ্ছন্তি, তথা নানাভাবাভিনয় ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি।"**[৬৫]

প্রশ্ন ওঠে রস থেকেই কি ভাব সমূহের অভ্যুদয় হয়, না ভাবগুলি থেকে রসের অভ্যুত্থান ঘটে। অনেকের মতে পরস্পর সম্বন্ধ হেতু উভয়েই উভয়ের উৎপত্তির হেতু। কিন্তু ভরত বলেছেন— এই মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, এটা সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাবসমূহ থেকেই রসনিবৃত্তি বা রসের অভ্যুদয় ঘটে—রস থেকে ভাবের উৎপত্তি হতে পারে না। যেহেতু

ভাবসমূহ বিবিধ অভিনয় সম্বন্ধীয় এসব রসগুলির উদ্ভাবন ঘটাচ্ছে সেহেতু নাট্যপ্রযোক্তাগণ এদের ভাব বলে পরিজ্ঞাত হন। অর্থাৎ রসের উদ্ভাবক বলেই তা ভাব। যেমন নানাপ্রকার দ্রব্যের সহযোগে বহুবিধ ব্যঞ্জনের উদ্ভাবন করা হয় তেমনি ভাবসমূহ অভিনয়ের সহযোগে রসগুলির উদ্ভাবন ঘটায়। ভাব ব্যতীত রস হয় না এবং ভাব ও রসবর্জিত হয় না। **'ন ভাব হীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ'**[৬৬] অভিনয়ে যে সিদ্ধি তা একমাত্র পরস্পরের সম্বন্ধ হেতুই সম্ভব হয়ে থাকে। যেমন ব্যঞ্জন এবং ভেষজের সংযোগে স্বাদুতার সৃষ্টি হয় সে রকম ভাব এবং রস পরস্পরকে উদ্ভাবিত করে। যেমন বীজ থেকে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ থেকে পুষ্প, ফলে অভ্যুদয় হয় তেমনি মূলরসসমূহে ভাবগুলি ব্যবস্থিত থাকে।

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে ততো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ।।[৬৭]

প্রেক্ষকগণ ভাবসমূহের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকেই তাঁরা রস আস্বাদন করেন। বাস্তবের বিচারে আচার্য ভরত রস সম্বন্ধে এই যথোচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব এই তিনের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। বিভাব শব্দটিতে বিজ্ঞান অর্থাৎ স্পষ্ট ভাবে জানা বোঝায়। বিভাব কারণ, নিমিত্ত, হেতু এগুলি এক পর্যায়ের শব্দ। অভিনয়ের মাধ্যমে নানা অর্থ আমাদের গোচর হয় এবং যা এই বোধগুলির প্রাথমিক বিকাশ ঘটায় তাই হচ্ছে বিভাব।

"বহবোঽর্থা বিভাব্যন্তে বাগঙ্গাভিনয়াশ্রিতাঃ।
অনেন যস্মাত্তেনায়ং বিভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ।।[৬৮]

আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাব দ্বিবিধ। কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয় দেখার সময় সহৃদয় সামাজিককের মনে যে অলৌকিক চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তার বিষয়ের নাম আলম্বন বিভাব। উদ্দীপন বিভাব আলম্বন বিভাবের দ্বারা অঙ্কুরিত রসের পরিপোষক। আলম্বন বিভাব চিত্তবৃত্তির প্রধান কারণ, উদ্দীপন বিভাব এর সহকারী কারণ। বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা বিষয় অনুভাবিত হয়, সে জন্য বাক্য, অঙ্গভঙ্গি ও উপাঙ্গ সংযুক্ত অনুভব নামে অভিহিত। অনুভাব হল কার্য—

বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যতস্ত্বর্থোঽনুভাব্যতে।

বাগঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্ত্বনুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ।।[৬৯]

চর্ ধাতু গতি বোঝায়। বাক্, অঙ্গ, এবং সত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত যে সব ভাব রসগুলিতে অবস্থানপূর্বক বিবিধ অভিমুখে সঞ্চরণ করে, সেগুলি হচ্ছে ব্যভিচারীভাব। **'বিবিধমভিমুখেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ।'**

বিভাবের দ্বারা কার্যের সূত্রপাত হয় এবং অনুভবের দ্বারা তা রস পরিগ্রহ করে। ভাব কেবলমাত্র নিজের মধ্যেই অনুভূত হয় এবং বিভাব জাগ্রত হয় পরিদর্শন থেকে। গুরু, মিত্র, প্রভৃতি যখন উপস্থিত হন তখনই বিভাবের প্রাপ্তি ঘটে। এঁরাই হচ্ছেন কার্যের হেতু। এরপর এঁদের দর্শনমাত্র আদান প্রদান, সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি কার্যগুলি অনুভাব, এই সবগুলিই কিন্তু স্থায়ীভাবের সঙ্গে যুক্ত। একটি স্থায়ী ভাবের সূচনা হচ্ছে বিভাব থেকে এবং তার কার্যগুলি হচ্ছে অনুভাব। যে সব ভাব স্থায়ীভাবের মত কোনও রসের একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট না থেকে অপরাপর রসেও সঞ্চরন করছে এবং স্থায়ীভাবের সহায়ক হচ্ছে সেগুলিই হচ্ছে ব্যভিচারীভাব। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব যথাক্রমে লৌকিক নিয়মে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের কারণ, কার্য ও সহকারী কারণ হলেও সহৃদয় সামাজিকের রসোদ্বধের প্রতি এরা সকলেই কারণ। বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব — এই তিনটি থেকেই স্থায়ীভাব সম্যক রূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলেই আচার্য ভরত রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে বিশেষ করে স্থায়ীভাবের উল্লেখ করেননি। এই কাব্যরসের অভিব্যক্তির কারণ স্বরূপ উনপঞ্চাশটি (৪৯) ভাব জ্ঞাতব্য। এদের সাধারণত্ব হেতুই রসগুলি নিষ্পন্ন হচ্ছে।

ভরতের রসসূত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন আচার্য বিভিন্ন ভাবে করেছেন। তন্মধ্যে আচার্য অভিনব গুপ্ত তাঁর অভিনবভারতীতে প্রধানত: চারটি মতের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করেছেন। **'বিভাবানুভাব ব্যভিচারী সংযোগাদ্রসন্নিষ্পত্তিঃ'**[৭০] এই সূত্র স্থিত সংযোগ পদের অর্থ হল সম্বন্ধ এবং নিষ্পত্তি পদের অর্থ হল উৎপত্তি, অনুমিতি, ভুক্তি ও অভিব্যক্তি। প্রথম ভট্টলোল্লট উৎপত্তিবাদ, দ্বিতীয় ভট্টশঙ্কুক প্রবর্তিত অনুমিতিবাদ তৃতীয় ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং চতুর্থ আনন্দবর্ধন, ভট্টতৌত এবং তদীয়শিষ্য অভিনবগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত অভিব্যক্তিবাদ। অভিব্যক্তিবাদেই রসের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ইহাই প্রসিদ্ধ আলংকারিক

আচার্যগণের সুচিন্তিত অভিমত। ভট্টলোল্লট পূর্ব মীমাংসাদর্শনের, শীশঙ্কুক ন্যায় দর্শনের, শ্রীভট্টনায়ক সাংখ্যদর্শনের এবং অভিনবগুপ্ত বেদান্তদর্শনের মতানুসারে নিজমত প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের প্রতিষ্ঠাই আচার্যগণের প্রাতিস্বিক উপলব্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উপলব্ধির মধ্যে সূক্ষ্ম তারতম্যের ফলেই তদনুসারে যুক্তিরও তারতম্য ঘটেছে। সাহিত্যে রসস্বাদের প্রকৃতি বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে যদিও সংবিদবিপ্রতিপত্তি সুবিদিত বটে, তথাপি একটি বিষয়ে সকলেরই মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে, রসাস্বাদের আনন্দস্বরূপতা। প্রকৃতপক্ষ রস আত্ম স্বরূপ - রসানুভূতির আনন্দ আত্মচৈতন্যেরই স্বরূপানন্দ, কেননা তৈত্তিরীয় শ্রুতি অনুসারে— **রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বহনন্দী ভবতীতি'**।[৭১]

নাট্যের রস হল আটটি—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত। পরবর্তী কালে আর একটি রসযোজিত হয়েছিল, তা হল শান্তরস। স্থায়ীভাব আটটি—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়। ব্যভিচারীভাব সংখ্যায় তেত্রিশটি (৩৩)—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, প্রবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস এবং বিতর্ক। সাত্ত্বিকভাব আটটি — স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়।

ভরতাচার্য এবং নাট্যলক্ষণকারগণ যে প্রেক্ষকবর্গের দৃষ্টিতে নাট্যে রসেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা অত্যন্ত সমীচীন এবং তাঁদের সূক্ষ্ম বিচার শক্তিরই অভ্রান্ত পরিচায়ক। কিন্তু শ্রব্যকাব্যের ক্ষেত্রে রসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ বিলম্ব ঘটেছিল। চিরন্তন আলংকারিকগণ — দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট প্রভৃতি প্রায় সকলেই প্রধানত: শ্রব্যকাব্যেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রব্যকাব্যের উদ্ভবের হেতু জিজ্ঞাসা শব্দ ও অর্থের স্বরূপ বিচার, শব্দ গুণ ও অর্থ গুণ সম্বন্ধে বিচার, শব্দালংকার ও অর্থালংকার, শব্দদোষ ও অর্থদোষ প্রভৃতির স্বরূপ নিরুপণ ইত্যাদি শ্রব্যকাব্য সম্বন্ধীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তাঁদের মনীযার বলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু তাঁরা দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে প্রায়শই নীরব।

শ্রব্যকাব্য যা মহাকাব্য খণ্ডকাব্য, কথা, আখ্যায়িকা, চম্পূ প্রভৃতি লক্ষণ নানাবিধ, তা অনভিনেয়ার্থ, অর্থাৎ শ্রব্যকাব্যের বিষয়বস্তু কেবল ভাষার সাহায্যে পাঠকের নিকট উপস্থাপিত হয়ে থাকে, তার জন্য কোনরূপ অভিনয়ের সাহায্য অনাবশ্যক। শ্রব্যকাব্যে বাচিক অংশই প্রধান। প্রাকৃতজনের নিকট শ্রব্য অপেক্ষা দৃশ্য অংশেরই আকর্ষণ বেশি। এই কারণেই সম্ভবত রূপক এবং উপরূপককে প্রধানত দৃশ্যকাব্য রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দৃশ্যকাব্যের অপর নাম অভিনেয়ার্থ কাব্য। কেননা, চতুর্বিধ অভিনয় অর্থাৎ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য, ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের সাহায্যেই কাব্যের অর্থ বা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়।

দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়বিধ কাব্যের বিচারের জন্য পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্র রচিত হয়েছিল। দৃশ্যকাব্যের বিচার 'নাট্যশাস্ত্রের' পরিধির অন্তর্ভুক্ত। শ্রব্যকাব্যের বিষয়ে আলোচনার জন্য কাব্যলংকারশাস্ত্রের প্রবর্তন হয়ে ছিল। এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। নাট্যরসকেই পরবর্তী আচার্যগণ কাব্যরসরূপে গ্রহণ করেছেন। দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়বিধ কাব্যেই অর্থমাত্র বিভাব, অনুভাব অথবা সঞ্চারীভাব হবেই—ইহা ভিন্ন গত্যান্তর নেই। কিন্তু যদিও মুখ্যতঃ বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের আলোচনা নাট্যশাস্ত্রেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ আছে, তথাপি পরবর্তীকালে আনন্দবর্ধন প্রভৃতি কাব্যমীমাংসকগণ ভরতাচার্যের অনুসরণে তাঁদের নিজ নিজ নিবন্ধে বিভাবাদি বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিস্তৃত ভাবে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। এদিক্ দিয়ে নাট্যশাস্ত্র এবং কাব্যালংকারশাস্ত্র উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়।

শ্রব্যকাব্য শব্দের সাহায্যে বিভাবাদির বর্ণন মাত্র থাকে, কিন্তু নাট্যে বা দৃশ্যকাব্যে বিভাবাদির উপস্থাপন সাধিত হয় চতুর্বিধ অভিনয়ের মাধ্যমে। দৃশ্যকাব্য হতে রসানুভূতি সামাজিকগণের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। কিন্তু শ্রব্যকাব্যে সামাজিকের পক্ষে রসগ্রহণ ততখানি সহজ হয় না। সহৃদয়তার উৎকর্ষের তারতম্যের উপর রসোপলব্ধিরও দ্রুততা বা মন্থরতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। শ্রব্যকাব্যে বিভাবাদির বর্ণনা থাকলেও সহৃদয় পাঠককে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে বহুবিধ কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। অনেক অনুক্ত বিষয় অনুমান করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তাই দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রে মুখ্যভাবে রসানুভূতি হওয়া সম্ভব, কিন্তু শ্রব্যকাব্যে বিভাবাদির উপস্থাপন যেহেতু শব্দের সাহায্যে ঘটে থাকে এবং 'শ্রব্য' শব্দ যেহেতু পরোক্ষ জ্ঞানের জনক, সেহেতু শ্রব্যকাব্যে বিভাবাদির সাক্ষাৎকারাত্মক উপলব্ধি অসম্ভব বলে পরিণামে

রসাস্বাদনও অসম্ভব হবার কথা। সুতরাং শ্রব্যকাব্যে কি রসাস্বাদ স্বীকার করা চলবে না? উত্তরে অভিনব গুপ্তাচার্য বলেন যে, শ্রব্যকাব্যেও যে রসাস্বাদন সহৃদয়গণের অনুভবসিদ্ধ, এর কারণ হচ্ছে প্রতিভাশালী সহৃদয়ের চিত্তে শব্দোপস্থাপ্য বিভাবাদির অভিনয়ের সাহায্য ছাড়াই, সাক্ষাৎকার কল্প জ্ঞান হয়ে থাকে, তখন তা নাট্যেরই সজাতীয় হয়ে ওঠে এবং তার ফলেই পরিশেষে সাক্ষাৎকারাত্মক রসোপলব্ধিও সম্ভব হয়। শ্রব্যকাব্যের ক্ষেত্রে শব্দোপহিত বিভাবাদির এই অপরোক্ষকল্প জ্ঞান সাধারণ নয়, এর জন্য ভাবয়িত্রী প্রতিভার উৎকর্ষ অপেক্ষিত।

নাট্যরসকেই পরবর্তী আচার্যগণ কাব্যরসরূপে গ্রহণ করেছেন। সর্বপ্রথমে ধ্বনিকার ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয় উদ্যোতে অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গের প্রয়োগস্থল বোঝাতে গিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ কারিকায় রসের উল্লেখ করেছেন এবং রস ধ্বনিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষ কোন ব্যাখ্যা উপস্থিত না করে আনন্দবর্ধন নাট্যরসকেই নাট্য ও কাব্যের রস বলে বুঝে নিয়েছেন। এবং কেবল রস শব্দ দ্বারা উভয়ের নির্বাচন করেছেন—

"রসভাবতদাভাসতৎপ্রশান্ত্যাদিরক্রমঃ।
ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ।"[৭২]
"বাচ্যবাচকচারুত্বহেতূনাং বিবিধাত্মনাম্।
রসাদিপরতা যত্র স ধ্বনের্বিষয়ো মতঃ।"[৭৩]

এ বিষয়ে আনন্দবর্ধন স্পষ্টত: ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন এবং রস সম্পর্কে নাট্য ও কাব্যকে একই শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন—

'এতচ্চ রসাদিতাৎপর্যেন কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি সুপ্রসিদ্ধমেব'[৭৪]

ধ্বন্যালোক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লোচনটীকার প্রথমভাগেই আচার্য অভিনবগুপ্ত রসের সংজ্ঞা করেছেন—

"শব্দসমর্প্যমান হৃদয়সংবাদ সুন্দর বিভাবানুভাব সমুদিত প্রাঙ্। নিবিষ্ট রত্যাদি বাসনানুরাগ সুকুমার - স্বসংবিদানন্দ চর্বণব্যাপার রসনীয় রূপো রসঃ।"[৭৫]

রস হচ্ছে সংবিদানন্দ বা চিদানন্দের আস্বাদন ব্যাপারের একটি রসনীয় রূপ। সোজা ভাষায় নিজ আনন্দের আস্বাদন রূপ ব্যাপারই রস। আচার্য মম্মট বলেছেন রসাস্বাদন হতে সম্ভূত হয় আনন্দ, আবার অভিনবগুপ্ত বলেছেন, আনন্দের আস্বাদন হচ্ছে রস। প্রকৃতপক্ষে ভাবতন্ময়চিত্তে আনন্দের প্রতিফলন বা প্রকাশই রস। কাব্যপ্রকাশকার মম্মটাচার্য বলেছেন—**'সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়াস্থিতঃস্থায়ী রত্যদিকো গোচরীকৃতঃ অলৌকক চমৎকারকারী, শৃঙ্গারদিকোরসঃ'**। অর্থাৎ সামাজিকের অন্তরে বাসনাকারে থাকে যে স্থায়ী রত্যাদিভাব তারই অসাধারণ বিস্ময়কর প্রকাশ শৃঙ্গারাদি হল রস।

রসতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাতা অভিনবগুপ্তের অভিমত আলোচনা করার পূর্বে ভামহ প্রভৃতি আদি আলংকারিকগণ কাব্যে নাট্যরসের প্রয়োগ সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর আলংকারিক ভামহ কাব্যে ভরত ব্যাখ্যাত নাট্যরসের প্রয়োগ বিষয়ে প্রতিকূল ধারণা পোষণ করতেন বলে মনে হয়। তিনি কাব্যে এই রসকে অলংকার বলে গণ্য করেছেন। অষ্টমশতাব্দীতে আচার্য দণ্ডী ভামহের ন্যায় রসকে কাব্যে অলংকার রূপে গণ্য করলেও রসবৎ অলংকারের ব্যাখ্যায় তিনি চমৎকার শ্লোক রচনা করে সুপ্রসিদ্ধ আটটি রসেরই উদাহরণ দিয়েছেন। স্থায়ীভাব যে রসতা প্রাপ্ত হয়, এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল বলে মনে হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর আলংকারিক বামনাচার্য রসকে কাব্যের অলংকার নয়, একটি প্রধান গুণ বলে বর্ণনা করেছেন—গুণটির নাম কান্তি—**'দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ'**।[৭৬] আচার্য দণ্ডীও কিন্তু মাধুর্যগুণের বর্ণনায় রসের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন—**'মধুরং রসবদবাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ**।[৭৭] প্রকারন্তরে তিনি রসকে গুণই বলেছেন। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আচার্য রুদ্রট কাব্যে নাট্যরসের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করে লিখেছেন—'কাব্যমাত্রেরই বিবিধ রস থাকা চাই, নতুবা কাব্য শাস্ত্রবৎ নীরস হয়ে যাবে এবং লোকে কাব্যপাঠে ভয় পাবে। তিনি পূর্ববর্তীদের ন্যায় নাট্যরসকে কাব্যে কেবলমাত্র অলংকার বা গুণ বলেননি।

পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীতে অভিনব গুপ্ত তাঁর অভিনবভারতীর ভাষ্যে ভরতমুনির নাট্যরস বোঝাতে গিয়ে নাট্যরস ও কাব্যরস যে বস্তুত এক, এই মত প্রচার করেছেন। তিনি

লিখেছেন—'**নাট্যাৎ সমুদয়রূপাদ্ রসাঃ যদি বা নাট্যমেব রসাঃ, রসসমুদায়ো হি নাট্যম্। ন নাট্যে এব চ রসাঃ, কাব্যেঽপি নাট্যায়মান এব রসঃ, কাব্যার্থ বিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনোদয়ে রসোদয় ইত্যুপাধ্যায়াঃ। অন্যে তু কাব্যোঽপি গুণালংকারসৌন্দর্যতিশয়কৃতং রসচর্বণম্ আহুঃ।**'

সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথ কাব্যলক্ষণে বলেছেন—'**বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্**'[৭৮] অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বিশ্বনাথাচার্য মুখ্যতঃ অভিনবগুপ্তের বিবরণকে সংক্ষিপ্ত করে পদ্যকারিকায় সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং মম্মটের রচনা থেকে সাহায্য নিয়েছেন—

সত্ত্বোদ্রেকাদ্ অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময়ঃ।
বেদান্তর-স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ।
লোকোত্তর চমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বীকারবদ্ অভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতেরসঃ।।[৭৯]

আচার্য জগন্নাথ রসের লক্ষণ বলেছেন—'**রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেবরসঃ**'[৮০] রত্যাদিবিশিষ্ট ভগ্নাবরণ চিৎ স্বরূপই রস।

নাট্য হতে রসসমূহের উৎপত্তি হয়, অথবা নাট্যই রস, রসই নাট্য। রসসমূহ কেবল নাট্যে নয়, কাব্যেও বর্তমান। কাব্যকৌতুকে বলা হয়েছে—'নাটকের ন্যায় অনুভূত না হলে কাব্যে আস্বাদ সম্ভব হয় না।' কাব্য মুখ্যতঃ নাট্যস্বভাবসম্পন্ন। ভরতমুনির নাট্যরসের ব্যাখ্যানের পর ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন এবং পরে অভিনবগুপ্ত কাব্যের রসকেও সর্বথা উহার সদৃশ মনে করে একই রস শব্দ দ্বারা উভয়কে বুঝিয়েছেন।

গাথাসপ্তশতী গ্রন্থটি যথার্থ লোকসাহিত্য না হলেও অনাগর জীবন যাত্রার বাতাবরণে এই গাথাগুলি রচিত। অধিকাংশই শৃঙ্গার রসের কবিতা, তাই তৎকালীন যৌন জীবনের বিচিত্র পরিচয় এখানে প্রকাশিত। প্রেমের চটুলতা, নারীহৃদয়ের গোপনভাষা নারীর যৌবন সৌন্দর্য, দাম্পত্য সুখের সমাচার, অসমাজিক অবৈধ প্রেমের লীলাখেলা, তারুণ্য প্রণয়ের রহঃকেলি, বেশ্যা-কুলটা জারের গোপন কামসম্ভোগ, আদিরসের ভাঁড়ামি, যৌনতার স্থূল উপকরণ, প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি বিষয় বৈচিত্র্যে গাথাগুলি অনবদ্য। শৃঙ্গাররসের লক্ষণে বলা হয়েছে—

"সুখপ্রায়েষ্টসম্পন্ন ঋতু মাল্যাদিসেবকঃ।
পুরুষপ্রমদাযুক্তঃ শৃঙ্গার ইতি সংজ্ঞিতঃ।।"[৮১]

সুখ বহুল, প্রিয় বস্তুযুক্ত, ঋতু মালা প্রভৃতির সেবক ও পুরুষ নারীর প্রেমের সঙ্গে যুক্ত রস শৃঙ্গার নামে অভিহিত। শৃঙ্গার রসে থাকে কল্পনার ঐশ্বর্য, আবেগের গভীরতা। সৌন্দর্যের নিবিড়তা এবং সুদূরের ব্যঞ্জনা। রোমান্টিক মনোভাবের লক্ষণ হল শৃঙ্গার রস। গাথাসপ্তশতীতে দেখা যায় নিত্যকালের কিশোর কিশোরীর, যুবক-যুবতীর, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার যে অখণ্ড প্রেমসত্তা তার অনুভূতির স্ফূরণ। শৃঙ্গার রস দুপ্রকার সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ। উদাহরণ যথা—

ক) **ন অ দিট্‌ঠিং ণেই মুহং ণ অ ছিবিউং দেই ণালবই কিং পি।**
তহ বি হু কিং পি রহস্‌সং ণব বহু সঙ্গো পিও হোই।[৮২]
[ন চ দৃষ্টিং নয়তি মুখং ন চ স্প্রষ্টুং দদাতি ন আলপতি কিং অপি।
তথা অপি খলু কিং অপি রহস্যং নববধূ সঙ্গঃ প্রিয়ঃ ভবতি।।]

খ) **বাআই কিং ভণিজ্জউ কেত্তিঅ-মেত্তং বলিক্‌খ এ লেহে।**
তুহ বিরহে জং দুক্‌খং তস্‌স তুমং চেঅ গহিঅখো।।[৮৩]
[বাচা কিং ভণ্যতাং কিয়ন্মাত্রং বা লিখ্যতে লেখে
তব বিরহে যৎ দুঃখং তস্য ত্বং এব গৃহীতার্থঃ।।]

আলোচ্য শৃঙ্গার গাথাগুলি সর্বস্তরের পাঠকসমাজে যে খুবই মনোহারী ছিল তার প্রমাণ পাই সংকলন কর্তার উক্তি থেকেই — অমৃতময় প্রাকৃত কাব্য পড়তে অথবা শুনতে যাদের অভিরুচি নেই, প্রেমের তত্ত্ব চিন্তা করতে তাদের লজ্জা হয় না কেন? ধ্রুপদী প্রণয় কবিতার শিল্পিত মণ্ডন কলা এবং ভাব ও ভাষার বৈদগ্ধ্যে সহৃদয় বিদ্বান পাঠকের আকর্ষণ ছিল বেশী, কিন্তু প্রাকৃত প্রেম কবিতায় সহজবোধ্য ভাষা, সুপরিচিত ভাব, বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডল এবং প্রাকৃত জীবনের কাম-কামনার কথা থেকে সকলেই রস আস্বাদন করতে সক্ষম হতেন। তাই সুরসিক কবি হাল বলেছেন যে এমন কবিতা শুনলে অমৃতেও অরুচি জন্মাবে।

কবি হাল তার কল্পনার জাল বুনেছেন তার সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে, গ্রাম্য প্রকৃতির পরিবেশ নিয়ে। কল্পনা বিচরণ করেছে গ্রামের হাটে, মাঠে, অরণ্যে, পর্বতে।

তাছাড়া তা বিচরণ করেছে নদীর ঘাটে ও ভগ্ন মন্দিরে। সেখানে কোন কৃত্রিমতা নেই, নেই অলীক ভাবনা। মানুষের সুখ দুঃখের সহমর্মী হয়ে কবি তার কল্পনার ছবি এঁকেছেন লেখনীতে। হালের কবি কল্পনা রোমান্টিকতায় সজীব। গতানুগতিকতায় নিষ্প্রাণ নয়। হাল তাঁর গাথায় যুক্তি তর্কের দ্বারা খাঁটিকেই স্থাপন করেছেন। মানুষ এবং প্রকৃতি যে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হালের এই 'গাথাসপ্তশতী' কাব্যটিতে তা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের জীবনের বহিঃরাজ্য এবং অন্তঃরাজ্যে প্রকৃতি যেন ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। কবি কল্পনায় একটি গাথায় দেখা যায় চন্দ্র যেন নায়িকার অতি কাছের বস্তু। চন্দ্র যেন তার আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী। আকাশের চাঁদ এবং মাটির মানুষের মধ্যে যেন তিনি একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

কবি হাল ছিলেন সাতবাহন সাম্রাজ্যের অধিপতি। তাঁর সাম্রাজ্য মহামাত্র, মহাসেনাপতি, অমাত্য প্রভৃতি মহা শক্তিধর ঐশ্বর্য্যের অধিপতিদের কাহিনীর অভাব ছিল না। কিন্তু কবি হালের কবি কল্পনা সে পথে হাঁটে নি। তাঁর কল্পনা কল্পলোকের শূন্যলোকেও বিচরণ করেনি। তাঁর কল্পনা পাখা বিস্তার করেছে সাধারণ মানুষের হৃদয় গহ্বরে। যেখানে বিরহ, দুঃখ নীরবে কাঁদে — প্রকাশের ভাষা পায় না। অথবা, অসহনীয় পুলক আপনি উছলে পড়ে — কোন কৃত্রিমতার ধার ধারে না।

অহঅং লজ্জালুইনী তস্‌স অ উম্মচ্ছরাঁই পেম্মাইং।
সহিঅ-অণো বি নিউণো অলাহি কিং পাঅ রাত্রণ।।[৮৪]
[অহং লজ্জালুঃ তস্য চ উন্মৎসরাণি প্রেমানি
সখী-জনঃ অপি নিপুণঃ অপগচ্ছ (অপোহি) কিং পাদ রাগেণ।।]

এর মধ্যে থেকে যা এসেছে অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখ বাস্তবের মাটি থেকেই এসেছে। কল্পনা শূন্যলোক থেকে নয়। কতকগুলি গাথা আবার ক্লাসিক ধর্মী। কিন্তু এই গাথাগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে এগুলিতে এমন সজীবতা ও বাস্তবতা রয়েছে যে তা গতানুগতিক ধাঁচ ভাবতে মন সায় দেয় না। রোমান্টিক বলেই হয়তো এরূপ মনে হয়। তবে এটাও ঠিক কোন কালের রোমান্টিকতা আবর্তিত হতে হতে পরবর্তীকালে বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য কোন কোন কবি

রোমান্টিকতাকে নির্ণীয়মান ক্লাসিক বলে থাকেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে সপ্তশতীর সুন্দর কল্পনাগুলো যেন রোমান্সে সজীব এবং সপ্তশতীর আলেখ্য ছায়ায় তা সুন্দরভাবে মানানসই হয়ে গেছে। গাথার কবিরা যেন যুক্তি তর্কের নিরীক্ষণ সত্যটাকেই স্থাপন করেছেন।

গাথা সপ্তশতীতে বর্ণিত সুন্দর প্রকৃতি ও মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করে বলা হয়েছে—

উব্বহই নব তণঙ্কুর রোমাঞ্চ-পসাহিআইঁ অঙ্গাইং।
পাউস-লচ্ছীঅ পত্তহরেহিঁ পরিপেল্লিও বিঞ্ঝো।।[৮৫]
[উদ্বহতি নব তৃণাঙ্কুর রোমাঞ্চ প্রসাধিতানি অঙ্গানি।
প্রাবৃড় লক্ষ্ম্যাঃ পয়োধরৈঃ পরিপ্রেরিতঃ বিন্ধ্যঃ।।]

বিভিন্ন বিষয় যেমন বন্ধুত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি সম্পর্কে যে সুভাষিতগুলি এতে পাওয়া যায়, তা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। এতে পারিবারিক সুখ গভীর এবং স্থায়ী প্রেম, স্বামীর দূরদেশে যাত্রার পূর্বে স্ত্রীর মর্মবেদনার চিত্র অতি নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে। এতে গ্রামের পটভূমিতে অতি সাধারণ কৃষক ও শিকারী পরিবারের গৃহবধুদের প্রেমের বিচিত্র দিক্ বর্ণনা করা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক্ থেকে বিন্ধ্যপর্বত, নর্মদা ও গোদাবরী নদী এই গাথাগুলির পটভূমি রচনা করেছে। এই গ্রন্থে মন্দির, স্থাপত্য, পূজা-পার্বন, দেশাচার, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ও বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ যেভাবে করা হয়েছে, তাতে একে অনায়াসে তৎকালীন সংস্কৃতির সমৃদ্ধভাণ্ডার বলা চলে। এই গাথাগুলিতে অল্পকথার সাহায্যে গভীর ব্যঞ্জনা যে ভাবে ফোটানো হয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে অতি শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য এগুলি রচিত হয়েছিল।

তাই সামগ্রিকবিচারে বলা যায় যে, হালের গাথাসপ্তশতী গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। কাব্য কাহিনীর সংগ্রহ ও বিন্যাসে কবির অবাধ গতিবিধি বিদ্যমান। আর সেই কাব্যকাহিনীকে যথাযথ রূপদান করার জন্য প্রতিভাবান কবি তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ শব্দ, অর্থ, ভাষা, ছন্দঃ, রীতি, বৃত্তি, গুণ, অলংকার ও ধ্বনি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন, যার ফলে কাব্যপাঠ করে সহৃদয় পাঠক রস উপলব্ধি করতে পারেন। হালের কবি কল্পনাও প্রশংসনীয়। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবি কল্পনা এমনভাবে যুক্ত হয়েছে যা পড়ে পাঠক আনন্দলাভে সক্ষম হন। কাব্য শাস্ত্রের সকল নিয়মের যথাযথ প্রয়োগ-দক্ষতা কবি হালকে যেমন পাঠকের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছে সে

রূপ কবি রচিত এই কাব্য পাঠ করে সহৃদয় পাঠক অনাবিল আনন্দলাভ ও রসোপলব্ধি করতে সক্ষম হন। উপস্থাপনার কৌশল, ভাবের গভীরতা, জীবনের অকৃত্রিম অনুভূতি প্রভৃতি গুণে হালের গাথা সপ্তশতী আজও অম্লান।